১৯ ই নভেম্বর ২০২০, বৃহস্পতিবার

দিবাগত রাত ১২ টার পর

কী হয়েছিল সেই দিন?

আবু উমার

প্রিয় ভাই ও বোনদের প্রতি লিখিত চিঠি-

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার যিনি বিশ্ব জগতের রব। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন তাঁর পক্ষ হতে মহা অনুগ্রহ। আর দিয়েছেন দ্বীন ইসলামের সঠিক বুঝ। ছলাত ও ছালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব নেতা মহান আল্লাহ তায়ালার মনোনীত রসূল (সাঃ) যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনার প্রতি। অতঃপর, সকলের প্রতিই আমার ছালাম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ রহমতে ও আপনাদের দোয়ার বরকতে আমিও ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর বন্দীর বিষয়টা নিয়ে হয়তো আমাদের অনেক শুভাকাংখী ও প্রিয় সাথিরাও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। অনেকেই আবার বাতিলের দাজ্জালি মিডিয়ার প্রচারে বিশ্বাসও করে নিয়েছেন। বিশেষ করে ২০ই নভেম্বর ২০২০ইং তারিখ শুক্রবারের বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার হেডলাইন দেখে। যেখানে লেখা ছিল 'রাজশাহী আঞ্চলিক আমিরসহ ৮ জিএমবি সদস্য গ্রেফতার'। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই সেই খবরের বাস্তবতা নিয়ে ভাবার চেষ্টাটুকুও করেনি। অথচ অনেকেরই বিশ্বাস ঘটনা সত্য। কাজেই ঘটনাটির বাস্তবতা সকলের নিকটই সূর্যের আলোর ন্যায় তুলে ধরার প্রয়াশেই আজকের লেখা এই প্রবন্ধটি '**কী হয়েছিল সেইদিন**'। যেন মানুষ বর্তমান প্রশাসনের বানানো বন্ধু নামের মুখোশের আড়ালে কী আছে তা জানতে পারে। হয়তো এটা পড়ার পর অনেকেই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারবে। আবার অনেকেই মনে করবে, প্রশাসন ভাই এমনটি করতে পারে? আবার আমার প্রবন্ধটা দেখে কিছু কিছু জিহাদী চেতনার ভাইদের মনেও কিছু সংশয় দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি শুধু এতটুকু বলব, প্রবন্ধের এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব, যাতে সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই। তবে এই ক্ষেত্রে আমি প্রবন্ধটিকে আরো মজবুত করতে কুরআন মাজিদের একটি আয়াত নিলাম। যেখানে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করিও না।"

(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াতঃ ৪২)

- আবু উমার

১৯ই নভেম্বর ২০২০ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে প্রায় ১১:৪৫ মি. পর হতে ঘটে যাওয়া একটি বাস্তব ঘটনা...

“কী হয়েছিল সেইদিন?”

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আবু উমার, লেখার তারিখ - ০২/০২/২০২১
মঙ্গলবার সকাল ৯টায় লেখা সম্পূর্ণ হয়েছে

অতঃপর সেইদিনের ঘটনা। সেখানে উপস্থিতিদের মধ্যে আমিও একজন। সেইদিন ১৯ই নভেম্বর ২০২০ ইং তারিখ। বারটা ছিল বৃহস্পতিবার। ঘটনাটি ছিল শাহ মখদুম থানা মোড় ও থানা গেটের মধ্যবর্তি রাস্তায়। বাড়িটি থানা গেট থেকে থানা মোড়ে যাবার সময় হাতের ডান পার্শ্বে। বাড়িটির পাঁচতলা নির্মাণের জন্য পিলার গাথা হয়েছিল যদিও। কিন্তু বাড়িটির কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছিল শুধুমাত্র নিচতলার। আর বাকিটা ছিল বসবাসের অযোগ্য। কাজেই সেই বাড়িটির নিচতলাতেই একটি ব্যচেলর মেস করা হয় আর সেখানেই ভাড়া হিসেবে উঠেন জুয়েল মাহমুদ। এবং সেই বাড়ির সাথেই ভাড়া নেন একটি দোকান। সেখান থেকেই শুরু করেন সে ক্ষুদ্র ব্যবসা। আর তার সাথে ব্যবসায় পার্টনারশীপ হন সেই মেসে থাকা আরো কয়েকজন ছেলে। যাদেই অধিকাংশই ছিল ছাত্র। ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে তাদের ব্যবসা। কিছু দিনের মধ্যেই তারা বিভিন্ন মানুষের চোখে পড়ে যায়। ঘটনাক্রমে সেই সকল মানুষের মধ্যেই ছিল অধিক সন্দেহকারী আরো দুইজন। যারা ছিল বর্তমান সময়ের অ্যামেরিকা ও ভারতের অর্থ দ্বারা পরিচালিত সংগঠন ‘ইসকন’ এর সদস্য। হয়তো আপনারা ইতিমধ্যে অনেকেই চিনতে পেরেছেন এই সংগঠনটিকে। তবুও এই সংগঠনটির কিছু বর্ণনা আমি লিখছি। যাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করা। আর বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে মুসলিম হতে ক্ষমতাচ্যুত করে ইসরাঈলী শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের চিন্তা হলো ইসলাম ও মুসলিমকে ধ্বংস করে মুসলিম দেশগুলোতে এক আল্লাহর ইবাদত বন্ধ করে বহু দেব-দেবীর পূজার প্রচলন করা। তারই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশেও রয়েছে তাদের বড় এবং শক্ত একটি অংশ। আর এই অংশটিই বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে মুসলমানদের প্রতি ষড়যন্ত্র ও জুলুম করে যাচ্ছে। তাদের জুলুমের মধ্য হইতে কয়েটি ঘটনা আমি উল্লেখ করছি। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, নোয়াখালীতে এক গৃহবধুকে বিবস্ত্র করে ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা। যা গোটা দেশের জন্য ঘৃণিত ও কলংকৃত এক ঘটনা। তবে কি জানেন এই ঘটনার মূল কারণ? যা সেখানকার অনেক স্থানীয় লোকেরও অজানা। তার মূল ঘটনাতেই ছিল ভারত ও ইসকন। ভারতের ইসকন সদস্যের এক গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশের মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার বৃদ্ধি করার। যেন বাংলাদেশের মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে কোন আন্দোলনে ঝুকে পড়ে। ফলে যেন আরো একটি ‘শাপলা চত্তর’ এর ঘটনা বাংলাদেশে রচিত হয়। সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল, বাংলাদেশের মুসলিম মেয়েদেরকে ধর্ষণ কর। তাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দাও। তাদের অর্থ-সম্পদের ক্ষতি কর। এক্ষেত্রে তাদের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি কোন বাধা আসলে বা সমস্যা সৃষ্টি হলে তা সংগঠনের দায়ভার। আর সেই সিদ্ধান্তের উস্কানির কয়েকদিন পরেই ষড়যন্ত্র করে নানা অযুহাতে ধর্ষণ করা হয় নোয়াখালির সেই গৃহবধুকে। ধর্ষকদের ও তার সহযোগীদের মধ্যে তিনজনই ছিল ইসকন সংগঠনের সদস্য ও দায়িত্বশীল। আর সেই ধর্ষণের পরেই সাময়িক কিছু সমস্যাতে ধর্ষক পড়লেও

তার সম্পূর্ণ দায়ভার নিয়েছে 'ইসকন'। পুলিশ ধর্ষককে গ্রেফতার করলেও, কয়েক মাসের মাথাতেই জামিনে বের হয়ে মানুষ সমাজেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামী। একটু কি ভেবে দেখেছেন এই বিষয়টা? প্রশ্ন বিবেকসম্পন্ন ব্যাক্তিদের নিকটে। অতঃপর আরো একটি ঘটনা!

২০২০ ইং সালে দূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের ছোট-বড় বিভিন্ন বাজারে, মোড়ে। স্কুল ও কলেজ মাঠে। এমনকি মুসলমানদের মাসজিদের সিমানার মধ্যে মসজিদের সামনের ফাকা জায়গায়। যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক স্থানে নির্যাতিত হয়েছে মাসজিদের ইমামসহ সাধারণ মুসলমানও। একটু কি ভেবে দেখেছেন এই বিষয়টা? প্রশ্ন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকটে। পূজা হবে মন্দিরে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাসগৃহে। পূজা কেন পথে-ঘাটে? বাজার, মোড়ে, মাসজিদ মাঠে? অতঃপর আরো একটি ঘটনা!!
কোথায় হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের ঘর-বাড়ি পুড়েছে, তার কোন বাস্তবতা নেই। আর সেই প্রতিবাদে আন্দোলনে রাজপথে ইসকর সদস্যরা। আরো একটি ঘটনা, প্রকাশ্যে দিবালোকে বাংলাদেশের আলেম-উলামাদের শহর চট্টগ্রামে আলেমদের অশ্লীল ভাষায় ইসকনের মিছিল "হেফাজতের দুই গালে….। (নাউযুবিল্লাহ)

একটু ভেবে দেখেছেন এই বিষয়টা? প্রশ্ন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট। এছাড়াও ইসকনের সেই সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশের অসংখ্য মুসলিম মেয়েরা হয়েছে ধর্ষণের শিকার। এখনও ভাবুন, ভাবার সময় আছে। মুসলিম বৃদ্ধদের জাগতে হবে, মুসলিম যুবকদের লড়তে হবে। ভুলে যাবেন না, এমনও তো হতে পারে আপনি/আপনাদেরই কেহ আপনজন ইসকনের বলির শিকার। যাই হোক, এই কথাগুলো জানার পরেও হয়তো অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, দেশে এত মানুষ থাকতে তাদেরকেই কেন সন্দেহের নজরে দেখলো ইসকন সদস্যরা। তার মূল কারণ, সেই বাড়িটির মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল যুবক/কিশোর আর শিশুতে বিভক্ত। আর তারা সকলেই ছিল মুসলিম, নামাজি, সত্যবাদি আর কুরআন তেলাওয়াতকারী। ন্যায়পরায়ণ ও মানুষের সাথে উত্তম আচরণকারী। এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, এই গুলো করলে সমস্যা কী? তবে আমি বলব, হয়তো আপনি কাওকে অন্ধ অনুসরণ করে যাচ্ছেন, যার ফলে আপনার চোখে অনেক কিছুই ধরা পড়ছে না। তবুও মনে করিয়ে দেবার জন্য লিখছি। আপনারা জানেন বাংলাদেশে জঙ্গীদের চেনার জন্য ১৯ টি লক্ষণ বাংলাদেশের অন্ধবুদ্ধিজীবীরা উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে (১) জঙ্গীরা যুবক বয়সেই হঠাৎ নামাজ পড়া শুরু করবে অথবা নামাজে পরিবর্তন করে নামাজ পড়া শুরু করবে, (২) হঠাৎ দাড়ি ছেড়ে দিবে (৩) পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নামাজের কথা বলবে (৪) পায়ের টাখনুর উপরে প্যান্ট পড়বে (৫) ছোট-বড় সবাইকে সালাম দিবে (৬) প্রগতিশীল বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করবে এমনি আরো ইত্যাদি। যেই লক্ষণগুলোর সবকটাই একজন খাটি মুমিন হবার লক্ষণ সেই লক্ষণগুলোকে সক্রিয় জঙ্গী হবার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সর্বশেষ যেই লক্ষণটিকে বলেছে তা হলো, শুদ্ধভাবে সালাম দেওয়া জঙ্গীর লক্ষণ! নাউযুবিল্লাহ। মুসলমানদের দেশে এই নাস্তিক বেয়াদবগুলো ছালামকে কটাক্ষ্য করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সাহস পায়। এতেও কি বুঝা যায় না, তাদের এই সাহস তারা কোথা থেকে পায়? একটু কি ভেবে দেখেছেন এই বিষয়টি? প্রশ্ন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকটে।
তো যাই হোক। খাঁটি মুসলমান হবার সকল লক্ষণগুলোই ছিল সেই ছেলেদের মাঝে। আর এটাই ছিল ইসকন সদস্যের মাথা ব্যাথার কারণ। তারা পর পর দুইবার এই নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিভিন্ন অবৈধ অস্ত্র নিয়ে যায়, তাদের বাড়ির ভেতর গেট পর্যন্তও। এমনকি তারা এটাও জানতো এই বাড়ির ভেতরে রয়েছে অতি সাধারণ কয়েকটি ছেলে। যাদের অধিকাংশই অসুস্থ আর ২/১ জন অনেক ছোটও বটে। কাজেই এ কারণেই এই ইসকন সদস্যদের এই হত্যার

সিদ্ধান্তকারী দলটির নিজেদের মধ্যেই তৈরি হয় দ্বিমত। ফলে দ্বিতীয় বারের দিনেও তাদেরকে হত্যা করতে বাড়ির ভেতর গেট পর্যন্ত গেলেও পরে তারা ফিরে আসে। আর সেই দিনেও সেই বাড়িতে ছিল কয়েকজন মেহমান। আর কৌশল করে সেই বাড়িতেই সেই ছেলেদের সহ তারা ছবি তুলে, দুই/একজন মেহমানেরও। অতঃপর তারা ফিরে যায় আর সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের বিষয়ে র‍্যাবকে উস্কানি দেবে। ফলে র‍্যাব তাদেরকে গ্রেফতার করবে। তারই ধারাবাহিকতায় সেই দিন ১৯ই নভেম্বর ২০২০ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার, প্রতিদিনের ন্যায় সেইদিনও তারা সারাদিনের কর্মব্যস্ততা সেরে রাতে ঘুমানোর উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বিছানাতে যায়। অনেকে ঘুমিয়েও যায়। রাত প্রায় পনে বারোটা। হঠাৎ শোনা যায় বাড়ির ভেতর গেটের কাঠের দরজায় আঘাতের বিকট শব্দ। যেন লোহা জাতীয় কিছু দিয়ে কাঠের উপর আঘাত করা হচ্ছে। শব্দ শুনেই শান্ত ও জুয়েল রানা নামে দুইজন জেগে যায়। তারা কে?, কে? বলে চিৎকার করে। ফলে তাদের সাথে থাকা আলিফ নামে শিশুটি জেগে যায় ঘুম থেকে। ততক্ষণে পাশের রুমে থাকা শারীরিক অসুস্থ জুয়েল মাহমুদ জাগনা পেয়ে গেছে। অতঃপর শান্ত গেটে শব্দকারীদের চোর/ডাকাত সন্দেহ করে লাঠি-সোঠা অনুসন্ধান করলেও জুয়েল রানা ছিল বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। সে বুঝে যায় হয়তে এরা পুলিশ হবে। তবুও বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবার জন্য সে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কারা? গেটের বাহির থেকে শব্দ আসে, 'গেট খুলে দে, আমরা পুলিশের লোক'। অতঃপর জুয়েল রানা সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুইজনকে আদেশ করে গেট খুলে সরে আসতে। যেন গেটের ধাক্কায় বাকি দুইজন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।
অতঃপর, বাড়ির ভেতর ডুকে যায়, প্রায় ২৫/৩০ জন সিভিল পোশাকে সুঠামদেহী কিছু মানুষ। যাদের হাতে ছিল বড় বড় পিস্তল। তাদেরকে বিভিন্ন কথা বলে ক্ষিপ্ত করছিলো তাদেরই এক সদস্য। যার ছিল বড় বড় চুল, মুখ ক্লিন সেভ, চেহারা ছিল কালো শ্যামলা বর্ণের, হাতে ছিল এ্যান্ড্রয়েড ফোন। যাতে এই ছেলেদের ২/১ জনের ছবিও তোলা ছিল। অতঃপর তাদের অধিকাংশেরই পোশাকের উপর পরা ছিল কালো কোট। যাতে লেখা ছিল RAB।

অতঃপর তারা শান্তকে হাত পিছনে দিয়ে হাতে হ্যান্ডকাপ দিয়ে বসিয়ে রাখে। আর শিশু আলিফকে মার-পিট শুরু করে। তার সাথে জুয়েল রানাকেও হালকা কিছু মারপিট করে। এবং পরবর্তীতে তারা পাশের রুমে ডুকে গ্রেফতার করে জুয়েল মাহমুদকে। তখন বাকি তিনজন একভাবেই তাকিয়ে ছিল মাহমুদের মুখের দিকে। আর তাদের চোখের ভাষা যেন ছিল, এই কালো পোশাকধারী র‍্যাব বাহিনী যেন এই অসুস্থ ভাইটিকে মার-পিট না করে। তখন শিশু আলিফের উপর একাধারে ৩/৪ জন র‍্যাবের টর্চারিং চলছেই। আর কয়েকজনের ছবি দেখিয়ে বলছে, বাকিগুলো কোথায়। এই র‍্যাবের মধ্য থেকে হটাৎ একজন বলে উঠে, 'মামু, এই বাড়িতে বাকিগুলো থাকে না, তারা অন্য বাড়িতে থাকে আর আমি তা চিনি'। এই কথা শুনেও তারা আলিফকে একের পর এক টর্চারিং করেই যেতে থাকে। সাথে জুয়েল রানার সাথেও উচ্চবাচ্চ শুরু করে। তারা দুজনেই শুধু তাকিয়ে ছিল মাহমুদের মুখের দিকে। আর নিরবেই সহ্য করে যাচ্ছিল তাদের নির্যাতন। এমন অমানবিক নির্যাতন দেখে মাহমুদও নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। তাছাড়া ইতিমধ্যে সে সম্পূর্ণভাবে বুঝতেও পেরেছে যে, বাকি ৩ জনকেও বন্দি করবে এই র‍্যাব। তখন সে জুয়েল রানার দিকে ফিরে ইশারা দিয়ে জানাতে বলে, তাদের আমি চিনি। এটা এজন্য যে, আলিফ ও জুয়েল রানার প্রতি নির্যাতটা যেন কমে যায়। তারা জুয়েল রানার প্রতি নির্যাতনটা কমালেও শিশু আলিফের উপর নির্যাতন তখনও থামেনি। এরই সাথে র‍্যাব বাহিনী গোটা ঘর তল্লাশি শুরু করে দেয়। এবং ঘরে থাকা অনেক মূল্যবান সম্পদ লুটপাট/চুরি করে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১২ হাজার টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণের আংটি যা মাহমুদের ঘরে ছিল, নগদ কয়েক হাজার টাকা যা মাহমুদের ঘরে এক পারসোনাল ব্যাগে ছিল। টাকাটা সম্ভবত ছিল ব্যবসার। দামি দামি বেশ কয়েকটি মোবইল ফোন। ঘরে অন্যান্য ছোট খাটো মূল্যবান জিনিস।

অতঃপর এইগুলো লুটপাট করে তাদেরকে বের করে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নেয়। অতঃপর জুয়েল রানাকে তারা বাড়ির মেইন গেটের সামনে রাখা একটি সাদা হাইস গাড়িতে উঠায়। যার গ্লাস ছিল কালো। গাড়ির ভেতর থেকে সবকিছু দেখা গেলেও, বাহির থেকে কিছুই দেখার উপায় ছিল না। অতঃপর তারা বাড়ি থেকে মাহমুদকে বের করে গাড়ির সামনে নেয়। অতঃপর মাহমুদ পরবর্তীতে তার নিকটস্থ সাথীদের বলেন, 'যখন গাড়ির ভেতরে ঢুকানোর জন্য প্রস্তুতি নিলো, তখন আমি দেখলাম পাশাপাশি ৪ সিট বিশিষ্ট গাড়ির ডান পাশের শেষ সিটে জুয়েল রানা ভাইকে বসানো। আর তার বাম পাশের সিটেই বসে আছে আমার অতি পরিচিত একজন ব্যক্তি। যাকে দেখতে এতোটা সুন্দর ও সুঠামদেহী যা কল্পনাতেও আনা অসম্ভব। আর তার শরীর থেকে এক শুভাসিত সুঘ্রাণ ভেসে আসছিলো আমার নাসিকায়। আমি তাকে দেখে অনেক আনন্দিত হয়ে উঠলাম আবার চিন্তাও করছিলাম তার এখানে আসার কারণ সম্পর্কে। সে আমাকে ছালাম দিয়ে বলল, 'ভয় নেই, চিন্তা করবেন না। আর ধৈর্য ধরুন, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন'। একথা বলে সে মুহূর্তের মধ্যেই নাই হয়ে গেল। আর আমি অনেকটা চমকে উঠলেও, অন্তরে সাহস পেলাম। এই ঘটনাটি যেন আফগান মুজাহিদদের সাথে ফেরেস্তাদের ঘটে যাওয়া বহু ঘটনার মতোই একটি ঘটনা।

অতঃপর মাহমুদকে জুয়েল রানারই বাম পাশের সিটে বসানো হলো। যেখানে একটু পূর্বেই একজন সুন্দর ও সুঠামদেহী মানুষ বসেছিল। পরে মাহমুদের বাম পাশের সিটে শান্তকে এনে বসানো হলো। যার পরিধানে ছিল একটি জিন্সের প্যান্ট ও হাফ-হাতা একটি গেঞ্জি। শীতে তার শরীর মাঝে মধ্যেই কাপুনি দিয়ে উঠছিল। মাহমুদ তাদের দুজনের দিকে লক্ষ্য করে দুজনের দুই পায়ে তার দুই হাত রেখে শুধুমাত্র এটাই ফিসফিসিয়ে বলছিলো, 'ভয় নেই, ধৈর্য ধারণ করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে ইংশাআল্লাহ। অতঃপর গাড়ির ভেতর থেকেই বাহিরে দেখা যাচ্ছিল বাড়ির আশে পাশে প্রায় একশতাধিকেরও বেশি সশস্ত্র অবস্থায় র‍্যাব বাহিনী টহল দিচ্ছে। গাড়ির মধ্যেও বসে আছে কিছু র‍্যাব, তাদের মধ্য থেকেও অনেকেই বলছে, এটা করা ঠিক হলো না। বড় অভিযানের কথা বলে, বড় সন্ত্রাসী ধরার মিথ্যে কথা বলে অসুস্থ ও সাধারণ ছাত্রদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে কি লাভ? যাদের কোন দোষই নেই। তাদের মধ্য থেকে একজন বলেই উঠলো, অভিযানের দেখেছেন কী? অভিযানের অভিনয়ের সকল প্রস্তুতি তো কেবল চলছে, তা ভোর হলেই বুঝতে পারবেন। তখন শুনেও অভিনয়ের বিষয়টা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি মাহমুদ। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে টান দেয় এই গাড়িটি, বাকি ৩ জনকে গ্রেফতারের জন্য অন্য একটি বাড়িতে। তখনো শিশু আলিফ বাড়ির ভেতরেই আছে। আর তার উপর চলছে অমানবিক নির্যাতন। কখনো লাঠি দিয়ে পিটাচ্ছে, কখনো লোহা দিয়ে পিটাচ্ছে। আবার কখনো সেলাই মেশিন দিয়ে নখ উপড়ানোর ভয় দেখাচ্ছে, আবার কাথা সেলাই করার সুই তার হাতে বিদানোর ভয় দেখাচ্ছে। এই ভাবেই শিশুটির উপর ১০/১২ জন র‍্যাব সদস্য মিলে কখনো মানসিক টেনশন দিচ্ছে আবার কখনো শারীরিক নির্যাতন করছে। এরমধ্যেই শিশুটি ভয়ে ভীত হয়ে বাকশক্তি বন্ধের প্রায় উপক্রম। শীতে কম্পিত অবস্থায় শুধু একটি কথায় বলল, 'আমাকে শীতের ঐ সুইটারটি দিন'। নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট র‍্যাব বাহিনী শিশুটিকে শীতের পোশাকটি দিলেও, সেই পোশাকের পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে ছিল ছোট একটি বিদেশী পিস্তল, ৫টি গুলি আর একটি ম্যাগাজিন। আর প্রচার করতে থাকলো, এই জঙ্গীদের কাছে বিদেশী পিস্তল পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই পরের বাড়িটিতেও র‍্যাব ঢুকে লুটপাট ও চুরি শুরু করে এবং সেখান থেকে অন্যায়ভাবে আরো তিন জনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। যাদের নাম- আশরাফুল ইসলাম, আতিউর রহমান, জুয়েল শেখ। তিনজনই ছিল গুরুতর অসুস্থ। অতঃপর সেই তিনজন সহ গাড়িতে থাকা আরো দুইজন শান্ত ও জুয়েল রানাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আলাদা করে, শুধু পূর্বের সেই গাড়িতে থাকে মাহমুদ একাই।

অতঃপর শান্ত ও জুয়েল রানা এবং তাদের সাথে আরো একজন আতিউর রহমানকে যুক্ত করে র‍্যাব। আর এই ৩ জনকে নিয়ে সিরাজগঞ্জে রওনা হয় র‍্যাব। চলছে সেখানে নতুন এক অভিনয়ের ঘৃণিত প্রস্তুতি। অভিনয়ের বিষয়টা এখানে একটু উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। তা হলো, সিরাজগঞ্জ এর শাহজাদপুর থানার অন্তর্ভুক্ত উকিল পাড়াতেই (এলাকার নাম) থাকতো ২ জন ছেলে। যাদের একজনের নাম শামীম, আর অপরজনের নাম নাঈমুল। তাদের দুজনেরই স্থানীয় বাড়ি পাবনা, সাথিয়াতে। জানা যায়, এই 'শামীম' যাকে র‍্যাব 'সেকেন্ড ইন্ড কমান্ডার' বলে অ্যাখ্যায়িত করেছে আর রাজশাহীতে থাকা জুয়েল মাহমুদ যাকে র‍্যাব মাহমুদ নামে চিহ্নিত করেছে, তাদের দুজনের মধ্যে আছে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব। সে কারণেই গ্রেফতারের কিছুদিন পূর্বেও শামীম ও নাঈমুল বেড়াতে এসেছিলেন রাজশাহী মাহমুদ এর বাড়িতে। সেখান থেকে তাদের পিছু নেয় র‍্যাব গোয়েন্দা। সেই সূত্র ধরেই গত ২০ই নভেম্বর ২০২০ ইং তারিখে শুক্রবার শাহজাদপুর উকিল পাড়া র‍্যাব-৫ ও র‍্যাব-১২ মিলে অভিনয়ের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অর্ধরাতেই। আর তারা সাংবাদিককে জানান, রাজশাহীর জঙ্গীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই শাহজাদপুরের এই অভিযান। এটা সম্পূর্ণই মিথ্যা ও বানোয়াট। কারণ, শাহজাদপুর উকিলপাড়ায় এক বাসা ভাড়া করে মাত্র দুইজন ছেলে ওখানে থাকতো, যাদের নাম পূর্বেই বললাম। আর তাদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে আরো দুইজনকে, যাদের নাম- শান্ত ও আতিউর রহমান। যাদের রাজশাহীতেই গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ঐখানে নিয়ে গিয়ে ঐ দুইজনের সাথে যুক্ত করা হয়। আর শান্ত ও আতিউর রহমান, দুইজনের কেহই উকিলপাড়ার বাড়িটা চিনতো না। তাহলে র‍্যাব কিভাবে সেই বাড়ি চিনলো। অতএব, এটা স্পষ্ট যে, র‍্যাব পূর্ব থেকেই সেই বাড়িটি চিনে রেখেছিল এবং নজরদারিতে রেখেছিল। অতঃপর তারা জুয়েল রানাকে সিরাজগঞ্জ র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে গুম খানায় রাখে, আর শান্ত ও আতিউরকে উকিল পাড়ার ঐ বাড়িতে রেখে মোট ৪ জন এর একটি দল তৈরি করে অভিনয় করে যার কথা আমি একটু পরেই আরো ভালোভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইংশাআল্লাহ।

অতঃপর রাজশাহীর ঐ প্রথম বাড়িতে আলিফের নিকট নিয়ে আসে আরো ২ জন, আশরাফুল ইসলাম ও জুয়েল শেখকে এবং তাদের সামনে বিভিন্ন জিহাদী বই, বিদেশী পিস্তল, গুলি এবং ম্যাগাজিন রেখে স্থানীয় এলাকাবাসীকে ডেকে নিয়ে আসে এই অভিনেতা দল র‍্যাব বাহিনী। আর মানুষকে দেখায় এদের কাছে জিহাদী বই আর অস্ত্র পাওয়া গেছে। আর ইতিমধ্যেই মাহমুদকে তারা গাড়িতে করে নিয়ে রওনা দেয় যমুনা সেতুর দিকে। এই সময় রাজশাহীর প্রতিটা স্থানেই ছিল শত শত র‍্যাব। যারা সকলেই ছিল সশস্ত্র অবস্থায়। অতঃপর তাকে গাড়িতে করে রাজশাহী রেলস্টেশনের কাছে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে থাকা অবস্থাতেই তার চোখ বেধে দেয় র‍্যাব। অতঃপর আগে পিছে সশস্ত্র র‍্যাব বাহিনীর ৬টি গাড়ি রওনা দেয় যমুনা সেতুর উদ্দেশ্যে। তবে গাড়িটা তারা নাটোরের ভেতর বাগাতিপাড়া উপজেলার একঢালা বাজার দিয়ে নিয়ে যায়। এর কারণ ছিল একঢালা বাজারটি ছিল মাহমুদ এর নিজের এলাকা। র‍্যাব এর ধারণা ছিল মাহমুদ যদি রাজশাহীর বাড়িতে না থাকে তবে স্থানীয় বাড়িতে থাকতে পারে। কাজেই সেখানেও র‍্যাব এর বিপুল পরিমাণ সদস্য এলাকা ঘিরাও করে রাখে। অতঃপর তাদের সাথে নিয়েই গাড়িগুলো একটানে এসে থামে যমুনা সেতুর উপর। রাজশাহী থেকে আনার পথে র‍্যাব সদস্যরা তাকে অনেক মানসিক টেনশন দেয় এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করে। মাহমুদ একপর্যায়ে তাদেরকে বলেন, আমাকে ধরার কারণ কী? তারা বলে, 'তুই খুৎবাতে জিহাদের কথা বলেছিস সেই কারণে। আর তোর সাথে এত লোকের সম্পর্ক কেন? আর তোকে মানুষ এত বেশি ভালবাসে কেন? বিভিন্ন মাহফিলে মানুষ তোকে যেমন প্রোটেকশন দিয়ে নিয়ে যায়, আমরা এত প্রোটেকশনে বাংলাদেশের সরকারকেও নিয়ে যাই না। তোর পিছনে এই কয়েক দিনে আমাদের প্রায় ১০ লাখ টাকা খরচ করতে হয়েছে'। মাহমুদ বলে, 'কে আপনাদেরকে এতো টাকা খরচ করতে বলেছে কোন কারণ ছাড়াই? আর আমার সাথে থাকা অন্যান্য ছেলেরা কোথায় তা আমাকে দেখান'। উত্তরে তারা বলে, 'তোকে তাদের

দেখার চিন্তা করতে হবে না, তুই এখন তোর নিজের চিন্তা কর'। এমন বিভিন্ন তর্ক-বিতর্কই হয়েছে মাহমুদের সাথে তাদের। অতঃপর, শারীরিক অসুস্থ মাহমুদকে তারা যমুনা সেতুর উপর দাড় করিয়ে চোখ দুটো খুলে দেয় এবং বলে, শেষ বারের মতো পৃথিবী দেখে নে, নেতৃত্ব দেবার শখটা মিটে যাবে। তখন মাহমুদ বলে, 'আমার এখানে এইভাবে মৃত্যু যদি আল্লাহ তায়ালা না লিখে রাখেন, তবে কেহই আমাকে মারতে পারবে না। ইংশাআল্লাহ'। ইতিমধ্যে তাদের একজন ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, 'তোর আল্লাহকে লাগবে না, আজ তোকে মেরে ফেলার জন্য আমরাই যথেষ্ট'। (নাউযুবিল্লাহ)

এই কথা বলার পরেই তারা মাহমুদ এর দিকে অস্ত্র তাক করে, সেও তখন মনে মনে আল্লাহর তাওহীদ ঘোষণা করতে থাকে। এমন অবস্থায় র‍্যাব এর এই টিম প্রধানের ফোনে একটা কল আসে, 'মাহমুদকে সিরাজগঞ্জ নিয়ে আসো'। অতঃপর তারা তাকে আবার চোখ বেধে গাড়িতে তুলে সিরাজগঞ্জ শাহজাদপুর এর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এসময় তারা তাকে বলে, এখন বেঁচে গেলেও তুই রাত পর্যন্ত অপেক্ষা কর। অতঃপর তারা তাকে গাড়িতে থাকা অবস্থাতেই শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। কখনো তাদের সাথে থাকা সেলাই মেশিন এর মতো একটি যন্ত্র দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে চাপ দিতে থাকে। যার ফলে তার শরীরে রক্ত জমা অনেকগুলো দাগ হয়ে যায়। আবার কখনো দুই পায়ের হাঁটুর কিছুটা নিচে এবং হাটুর কিছুটা উপরে বিদ্যুৎ শট্ এর একটি মেশিন দিয়ে চাপ দেয় এবং বিদ্যুৎ শট দেয়। অনুরূপ তার দুই হাতের কনুইয়ের উপরে ও নিচের অংশেও তাই করে। এবং তার পুরুষাঙ্গেও বিদ্যুৎ শট দেয় র‍্যাব। এমনভাবে টর্চারিং করতে থাকে শারীরিক অসুস্থ ব্যক্তি মাহমুদের উপর। এতেও ক্ষান্ত হয়নি তারা। তাদের মধ্য থেকেই পরামর্শ এলো, 'এই সালার পায়ে ও মাজায় বল নেই ঠিকই, কিন্তু সে মাথার ব্রেন দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করে। তাই তার মাথার ব্রেন শর্ট করে দিতে হবে যেন সে পাগল হয়ে থাকে আর মানুষ তার কথা না শোনে'। কথা যা, কাজও তাই। তার মাথায় এক হালকা বিদ্যুত শট দেয়। যার ফলে সে বেশ কিছুক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে থাকে। প্রত্যেকটি নির্যাতনেই সে জ্ঞান হারালেও অধিক সময় জ্ঞান হারিয়ে থাকে সে, মাথায় বিদ্যুৎ শট দেবার পর। তা ছাড়া বারবারই তারা ট্রিটমেন্ট করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে, আবার টর্চারিং করে। এভাবেই তারা শাহজাদপুর জর্জ কোর্টের সামনে এসে উপস্থিত হয়। তখনো সকাল হয়নি, অন্ধকার আছে চারিদিকে। অতঃপর মাহমুদ র‍্যাবকে জানায় তার প্রচন্ড প্রস্রাব এসেছে। সে প্রস্রাব করতে চায়। অনেক বলার পর তারা তাকে টেনে হেচড়ে গাড়ি থেকে নামায় এবং প্রস্রাব করতে সময় দেয়। অতঃপর সে প্রস্রাব করে তাদের থেকে টিস্যু চায়, ফলে তারা তাকে টিস্যু দিতে অস্বীকার করলেও তাদের মধ্য থেকেই একজন একটি টিস্যু তাকে দেয়। অতঃপর তারা ৩/৪ জন মিলে টেনে হেচড়ে আবার গাড়িতে উঠায়। এবং বসিয়ে রাখে সেখানে। সেই মুহূর্তে ফজরের আযানও হয়ে গেছে চারিদিকে। ক্রমে ক্রমে দেখা যাচ্ছে সূর্যের আলো।

সেইদিন শুক্রবার ২০ই নভেম্বর ২০২০ইং তারিখ। অতঃপর র‍্যাবরা উকিল পাড়ার বাড়ি ঘিরে আছে অনেক আগে থেকেই। এখন তারা নিজেরা দুই দিক থেকে আকাশের দিকে গুলি ছুড়ছে আর বলছে, 'জঙ্গীরা বাড়ির ভেতর থেকে গুলি ছুড়ছে'। বিভিন্ন অভিনয় চলে সেখানে প্রায় ১১ ঘন্টারও বেশি। ইতিমধ্যে সময় টিভি সহ বিভিন্ন চ্যানেল থেকে খবর প্রচারিত হয়, র‍্যাবের সাথে জঙ্গীর বন্দুকযুদ্ধের। যা শুনে মাহমুদ আরো বেশি মানসিক টেনশনে পড়ে যান। কারণ তিনি আগে থেকেই কিছুটা জানতেন, র‍্যাব যেখানেই এই ঘৃণিত অভিনয়টি করেছে, সেখানেই তারা আগে থেকেই ২/১ জনকে ক্রসফায়ার দিয়েছে। তারপর এই অভিনয় করেছে। এখানেও কি তাই হলো?
সে শুধু মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। পরে শোনা যায় ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে সৈন্য নিয়ে এসেছে। তখন সে আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে। নিশ্চিত কোনো এক দূর্ঘটনা ঘটেছে!

এছাড়াও আশেপাশে থাকা র‍্যাব সদস্যরা একে অপরের সাথে ফোনে কথা বলছে, অভিযান সাকসেসফুল, কাজ ফিনিশিং- এই সকল কথাগুলো তাকে কঠিভাবে মানসিক টেনশনে ফেলে। অতঃপর, প্রায় পৌনে একটা পর্যন্ত এই অভিনয়গুলো চলতে থাকে। অবশেষে তারা বাড়িতে গ্রেফতার করে ৪ জন ছেলেকে বাহিরে আনে। যাদের বয়স ছিল ১৮-২২ এর মধ্যে। যাদের কাছ থেকে র‍্যাব উদ্ধারকৃত জিনিসপত্র দেখায়- ২টা ছোট বিদেশী পিস্তল, ৫/৬ পিস গুলি, ২টি ম্যাগাজিন, কিছু বিস্ফোরক, ২টি ছোট চাকু, ১টি রাইস কুকার, আরো অনেক কিছু।

এখন একবার ভেবে দেখুন, দুইটা ছোট পিস্তল আর দুইটা ছোট চাকু দিয়ে জঙ্গীরা প্রায় ১১ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে র‍্যাব -এর সাথে বন্দুক যুদ্ধ করল, আর র‍্যাব, ডিবি, পুলিশ এমনকি ঢাকা থেকে স্পেশাল ফোর্স এসে বড় বড় অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করল! এটা মিথ্যা অভিনয় নয়? এক প্রশিক্ষিত সরকারি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে ছোট ছোট ৪ জন ছেলে ছোট দুইটি পিস্তল নিয়ে ও ছোট দুইটি চাকু নিয়ে যুদ্ধ করল! এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, এটা স্পষ্ট ঘৃণিত অভিনয়। বলতে পারেন তাহলে এটা করে র‍্যাব এর লাভ কী? তাদের লাভই সব। কারণ, বিএনপি সরকার তাদের তৈরি করলেও এটা সম্পূর্ণভাবেই পরিচালনা করে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার। আর সরকার তাদের কাছ থেকে চায় কাজ। কাজ ছাড়া সরকার তাদের বেতন দিবে কেন? আর এদের কোনো কাজও নেই। একটু ভালোভাবে খোজ নিয়ে দেখবেন এই বাহিনীর প্রধান সাড়িতে যারা আছে, তাদের বাড়ির কাজের লোক হিসেবেও রেখেছে এই বাহিনীর অনেক সাধারণ সৈনিকদের। এমনকী তাদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মল-মূত্রও পরিস্কার করিয়ে নেয় অনেককে দিয়ে। হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেন এই কথাগুলো বাড়াবাড়ি। মোটেও বাড়াবাড়ি নয়। যদি পারেন একটু ভালোভাবে সন্ধান করে দেখবেন, কথাগুলোর বাস্তবতা পাবেন। যদিও তারা সরকারি চাকুরি করে, দিনে দিনে তাদের অবস্থান আরো নিচেই নেমে যাচ্ছে, তাদের অন্য কোন কাজ নেই। কাজেই তারা নিজেদের চাকরি ও এই বাহিনীটা টিকিয়ে রাখার জন্য এবং তাদের প্রমোশন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ধরণের এই নাটকগুলো তারা করে আসছে। আর সরকারও তার সঠিক তদন্ত না করে ঐ নাটকের অভিনেতাদের প্রমোশন দিয়ে যাচ্ছে। আর সরকার তার সঠিক তদন্ত না করার কারণই হলো, সরকার বাচতে চায়, আর তা একমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার মাধ্যমেই সম্ভব। আর এই নিষ্ঠুর বাহিনীগুলো সরকারকে বুঝায়- এই জঙ্গীগুলো ক্ষমতা চায়, আপনাকে ক্ষমতা থেকে নামাতে চায়। তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করতে চায়।

এমন আরো নানা ধরণের কথা। কিন্তু এই কথাগুলোর একটিও সত্য নয়। সরকারকে তারা গাধা বানিয়ে, সরকারের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে খেতে চায়। এবং খাচ্ছেও। আর তারই একটি নমুনা এই নাটক। তাদের জঙ্গী ধরার কথা যদি শোনেন বা জানেন, তবে বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি হলে আপনার বিবেক কম্পিত হয়ে উঠবে। তারা নিজেরাই ফেসবুকে আইডি খুলে বসে আছে। বিভিন্ন সময়ে জিহাদী আলোচনা দিয়ে পোস্ট দিচ্ছে। যারা একটু জিহাদ প্রিয় তারা তাদের পোস্টে লাইক, কমেন্ট করছে। ফলে একসময় তাদের সাথেই এই জিহাদ প্রিয় ছোট ছোট কিশোরদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে। সুযোগ বুঝে তারাই গিয়ে আবার গ্রেফতার করে নিয়ে আসছে। আবার এমনো অনেক হচ্ছে যে, এই বাহিনীর সদস্যরা ফেসবুকে বিভিন্ন ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করে ভালো চাকরির অফার দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসছে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠাচ্ছে। এইগুলো হলো র‍্যাব এর অভিযান এবং গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা। তারা এই সকল নাটক না করে যাকে তারা সন্দেহ করছে তাকে একবার অবগত করতে পারতো যে, তুমি এই সকল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আছো, তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এই সকল কাজের মধ্যে আর যেও না, গেলে তোমার নামে মামলা দিয়ে জেলে

পাঠানো হবে। কিন্তু না, তাদের এমন মন-মানসিকতা নেই। কারণ তারা নিজেদের প্রমোশন চায়। আল্লাহর লা'নত এই সকল নিকৃষ্ট বাহিনীর প্রতি।

তো যাই হোক, আমি শুধু এতটুকু বুঝানো চেষ্টা করছি যে, অভিনয় করে প্রশাসনের লাভ কী। পূর্বের কথায় চলে যাচ্ছি। মাহমুদ তখনও গাড়ির মধ্যে বসে অধিক চিন্তা ও মনোবেদনা নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য প্রার্থনা করছে। অতঃপর, তাদের কাজ সম্পন্ন হবার পর একজন তার সামনে বলে উঠলো, 'কাজ ফিনিশিং'। এই কথাটি শুনে যেন সে প্রায় স্ট্রোকের উপক্রম। অতঃপর তারা গাড়ি নিয়ে রওনা দিলো সিরাজগঞ্জ র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে। সেখানে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করতেই তারা মাহমুদের সাথে শুরু করে আরো একটি নাটকীয় অভিনয়! যেন সে মানসিক টেনশনে মেন্টালি রোগী হয়ে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালা যার সাহায্যকারী, তাদের কি আর ক্ষতি করার কেহ আছে? তারা যেই অভিনয় করল তার বর্ণনা-

মাহমুদ তখনও গাড়িতে বসে আছে, গাড়িটি গিয়ে থামলো র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ের ভেতরে। গাড়িটা থামতেই গাড়ির সামনে এনে রাখা হলো একটি কাঠের কফিন বক্স। তখন তার চোখ দুটি খোলা। কফিন দেখেই সে আতঙ্কিত! সে ভেবেছে হয়তো সেই প্রিয় বন্ধুটির কফিন এটা, নয়তোবা কোন প্রিয় ভাই-এর। এই দৃশ্য দেখে তার চোখের পানি যেন ঝড়নার ন্যায় ঝড়তে শুরু করেছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কফিন বক্সের উপর এনে রাখল একটি সাদা কাপড়, যা দেখে সে আরো হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অতঃপর সেই অবস্থাতেই তাকে দুইজনে ধরে উচু করে একেবারে ভেতরে গুম খানায় নিয়ে যায় এবং গুম খানায় রেখে দেয়। অতঃপর তারা গুম ঘরের গেট আটকিয়ে চলে যায়। এখানে গুম ঘরের একটি বর্ণনা উল্লেখের প্রয়োজন অনুভব করছি, যেখানে তাকে রাখা হয়েছিল। রুমটি ছিল অতি ছোট। তার মধ্যেই ছিল টয়লেট, যেখানে বসে মাথা নিচু করে ইস্তেঞ্জা সারতে লাগলেও বাহির থেকে সবই দেখা যাবে। টয়লেটটি ছিল খুবই নোংরা এবং সেখানের বদনাটাও ছিল খুবই নোংরা। যা যেকোনো রুচিশীল ব্যাক্তিদেরই খুব সহজেই রুচি নষ্ট করে দেবে, সেই বদনার দিকে দৃষ্টি পড়লে। এরই মধ্যে খাবার নিয়ে আসে র‍্যাব সদস্যরা। যদিও এমন অবস্থাতে তার মুখের কোন রুচি নেই। স্বাভাবিকভাবেই যে কোন মানুষেরই সেই সময়ে রুচি না থাকারই কথা। তাছাড়া সে খেতে না চাওয়ায় তারা তার প্রতি উচ্চ-বাচ্চ শুরু করে দিয়েছে। খাদ্যও পেটে যায়নি তার সারাটা দিন। প্রিয় বন্ধুটির স্মৃতি ও সেই কাঠের কফিন বক্সের দৃশ্য- যা বারবারই তার মনকে অস্থির করে তুলছিলো। চাপা কান্নায় তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। কান্না জড়িত কণ্ঠে শুধু একটাই কথা ছিলো, 'হে আমার রব! আমার প্রিয় বন্ধু ও সাথীদের হেফাজত করো, তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত মেলাও। হে আসমান ও জমিনের রব! তুমিই সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান'। তবুও তার কান্নার কোন মূল্যই ছিল না সেই নিষ্ঠুর নিকৃষ্ট বাহিনীর সদস্যদের নিকট। ক্রমান্বয়ে তার সাথে কঠোরতা বৃদ্ধিই করছিল এবং খাদ্য খাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল। অতঃপর, সে অযু করে তার কাযা ছলাত ফজর, যোহর ও আসর আদায় করে নেয়। অতঃপর, তাদের দেয়া খাদ্য থেকে অল্প সামান্য খেয়ে তাতে পানি ঢেলে দেন। তার খাবার সময় ঘটে যায় আরেকটি আজব ঘটনা। সে ভেবেছিলো তার সাথে রাজশাহী থেকে হয়তো অন্যানদেরকেও নিয়ে এসেছে। কাজেই সে তার পাশের রুমে একজনের উপস্থিতি অনুভব করলো, আর ভাবলো নিশ্চয়ই আলিফকেই ঐ রুমেই রাখা হয়েছে। তাই সে বারবার আলিফের নাম ধরে ডাক দেয় এবং আলিফও সেই ডাকে সাড়া দেয় এবং সে বলে, 'আলিফ, ভাই আমার, কষ্ট পেয়ো না, খেয়ে নাও, আমি তোমার পাশেই আছি'। আলিফ বলে, 'ভাই, আমি কোন কষ্ট পাচ্ছি না। আমি তো আমার আল্লাহর কাজেই নিয়োজিত আছি'। সে বলে, 'আলিফ, ভাই আমার, আমার কাছে একটি ডিম আছে, যা তারা আমাকে খেতে দিয়েছে, তুমি হাত বাড়িয়ে তা নাও এবং খাও, আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না'। আলিফ বলে, না ভাই, আপনি খান। আমিও খেলাম।

সে বলে, 'ভাই আলিফ, আমার শামীম কোথায়? আল্লাহ তা'য়ালা কি তাকে আমার সামনে আনবেন না?' আলিফ বলে, 'হ্যাঁ ভাই আনবে, খুব তাড়াতাড়িই আনবে। আর আপনিও তাকে সুস্থ অবস্থায় দেখবেন'। সে বলে, 'আলিফ, অন্য ভাইয়েরা কোথায়?' সে বলে, 'ভাই তারা ভালোভাবেই আছে। আপনি চিন্তা করবেন না। আমার ছলাত আদায়ের সময় হয়েছে ভাই আমি ছলাত আদায় করতে শুরু করলাম'। এই কথা বলেই আলিফ মাগরিবের ছালাতে দাড়িয়ে গেল। মাহমুদ বলল, 'আমি সেই সময়ে তাকে ছালাতে এমন জোরে জোরে ও সুন্দরভাবে সুরা কিরাত পড়তে শুনলাম, এমন ভাবে আর কখনো শুনিনি'।

অতঃপর আমিও মাগরিবের ছালাত আদায় করে নিলাম। এসময় গুম ঘরের গেটের সামনে তাদের একজন এসে বলল, তাড়াতাড়ি বের হ। আমি বললাম, আমাকে ধরে তুলে দাড় করান। তারা দুইজনে আমাকে ধরে দাড় করালো। আর আমার কল্পনা ছিল, যখন আমাকে পাশের রুমের সামনে দিয়ে নিয়ে যাবে তখনই আমি রুমটির দিকে তাকাবো, যেন আলিফকে দেখতে পাই। এই ভেবে তাদের দুইজনের হাত ধরে আমি আমার পাশের রুমের সামনে আসলাম। যেখান থেকে একটু পূর্বেও আলিফ আমার সাথে কথা বলল। কিন্তু আমি রুমটির দিকে তাকিয়ে আবার ব্যাথিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সেখানে দেখি আলিফ নেই। তবে কে আমার সাথে কথা বলল? কে এত জোরে সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে ছলাত আদায় করল? আবার ভাবলাম, আলিফ তো কুরআন পড়তেই জানে না। তাহলে কে ছিল? সুবহানাল্লাহ। মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ১৪০০ বছর পূর্বেও যেমন ছিল ঠিক এখনো তেমনি আছে। এটাও আল্লাহ তায়ালার এক নিদর্শন। মূলত সেখানে আলিফকে নেওয়াই হয় নাই। আলিফ তখনো রাজশাহী র‍্যাব-৫ এর কার্যালয়ে। আর তার সাথে ছিল আশরাফুল ও জুয়েল শেখ। তারাও আল্লাহ তায়ালার কাছে বারবার কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছিল, 'হে আল্লাহ! মাহমুদ ভাই কোথায়? তাকে তুমি হেফাজত কর, আর নয়তো তাকে তুমি আমাদের সাথে দাও। আমরা তো কিছুই বুঝিনা। কি করব, বুঝে পাচ্ছি না'। হয়তো আল্লাহ তাদের এই মজলুম অবস্থার দু'য়া কবুল করেছেন। কারণ, সিরাজগন্জে র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে গুম ঘরে শুধু দুইজনকেই নেয়া হয়েছে। একজন মাহমুদ আরেকজন জুয়েল রানা। আর র‍্যাব-এর উদ্দেশ্যও ছিল তাদের দুইজনকেই গুম করার। কিন্তু এই মজলুমদের দোয়ায় আল্লাহর সাহায্য চলে আসে সেখানেও। রাজশাহীতে শুরু হয় সাংবাদিকদের উৎপাত। তারা জানতে চায়, যাকে দল আমীর বানানো হয়েছে সেই জুয়েল মাহমুদ কোথায়? অতঃপর সাংবাদিকদের এই উৎপাতে বিরক্ত হয়ে তারা বলে, 'সে পালিয়েছে। আমাদের একটি টিম হেলিকপ্টার দিয়ে তাকে খুঁজতে গিয়েছিল। যে হেলিকপ্টারটি ঢাকা থেকে আনা হয়েছে। আর আমরা ইতিমধ্যে জানতেও পেয়েছি তাকে পাওয়া গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এই সন্ধানকারী ফোর্সটি এসে পৌছে যাবে'। ঘটনাও তাই! তারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন কথা বলে থামিয়ে রাখছে আর একটি টিমকে সিরাজগঞ্জ পাঠিয়েছে মাহমুদকে আনতে। অতঃপর তারা র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে গিয়ে মাহমুদকে আনার সকল প্রস্তুতি নেয়। আর এই সময়েই মাহমুদকে গুম ঘর থেকে বের করা হয়। আর তাকে বের করার সময়েই সে আলিফের সন্ধান করে চমকে উঠেন। অতঃপর সে তাদের দুজনের হাত ধরে সামনের দিকে হাটতে থাকে। একটু সামনে এসে হঠাৎ একটি রুমের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় জুয়েল রানাকে। যে একটি লুঙ্গি পড়ে এবং একটি উলের ছোট সুইটার পরে দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের হাটুর নিচে ধরে বসে আছে। আর তার চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। অতঃপর সে এখানে থামতে চাইলেও থামতে পারলো না। তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। অতঃপর সে একটু সামনে গিয়েই বারান্দায় দাড়িয়ে হাতের ডান পাশের শেষ রুমে যা দেখলো, তা দেখে সে চমকে উঠে ভুলেই গেল! সে এখন কাঁদবে? না হাসবে? সে মনে মনে আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করতে লাগলো। কারণ ঐ রুমে ছিল তার প্রিয় বন্ধু শামীম ও তার সাথে ছিল নাঈমুল, শান্ত ও আতিউর। শামীমও মাহমুদে দেখে

অবাক। তার চোখ উপরে উঠে গেছে। তারা দুজনেই কি যেন বলতে চাইলো। কিন্তু তারা দুজনেই সেই ভাষা হারিয়ে ফেলেছে- কি বলবে এবং কীভাবে বলবে। অতঃপর, ভাই বলে, শান্ত সামনের দিকে অগ্রসর হতে চাইলেও কোনই কথা বলতে পারলো না। মাহমুদও ভাবলো, হয়তো আমাদের সবাইকে এক সাথেই রাখবে। আর কোন চিন্তা নেই। আর কফিন বক্সের দৃশ্যটাও মিথ্যা অভিনয় মাত্র। কিন্তু তাকে স্ব-যত্নে মাক্স পড়িয়ে, সুন্দর একটি হাইসে(হাইস গাড়ি) তোলে, রাজশাহীতে নিয়ে যাবে তাই।

কিন্তু সে তখনও ভেবেই আছে যে, হয়তো রাজশাহীতে তাকে কোন কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। আবার নিয়ে চলে আসবে। তখন আমরা একসাথেই থাকতে পারবো। কিন্তু সে এটাও ভাবছিলো, তাহলে আলিফ, আশরাফুল ভাই ও জুয়েল শেখ ভাই কোথায়? এমনি কথা ভাবছিলো আর হাইসের ভেতর বসে বাহিরে তাকিয়ে দেখছিল। সেই ৪ জনের অর্থাৎ, শামীম, শান্ত, নাঈমুল ও আতিউর এর বিভিন্নভাবে ছবি তুলছিল র‍্যাব। ছবি তোলার সময় মাঝেমধ্যে মুচকি হাসিও দিচ্ছিলো শান্ত আর আতিউর। আর নাঈমুল ছিল অনেক চিন্তিত। শামীমের চেহারায় কখনো চিন্তার ছাপ, আবার কখনো কান্নার। হয়তো তার বারবার মনে আসছিলো আনন্দময় মুহূর্তের স্মৃতিগুলো। আর এখন সে নির্যাতিত-বন্দী; জালিম বাহিনীর হাতে। এমনটিই দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতেই হাইসটির স্টার্ট দিয়ে দেয়। অতঃপর সে রওনা হয়ে যায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে। তার মনে তখন দুটি চিন্তা। এক, হয়তো কিছু সময়ের জন্য রাজশাহীতে নিয়ে যাচ্ছে। কাজ সারা হয়ে গেলেই আবার দিয়ে যাবে। তখন আমি থাকবো আমার প্রিয় বন্ধুটির কাছে। সে ভাবনায় তার মন আনন্দিত হচ্ছিলো আবার আরো একটি চিন্তা তার মনে আসছিল। তারা আমাকে এখান থেকে নিয়ে আবার অন্য কোথাও গুম করবে? না ক্রসফায়ার দেবার চেষ্টা করবে? যাই হোক, আল্লাহ তা'য়ালার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এমন ভাবনা ভাবতে ভাবতে সে রাজশাহীর মধ্যে পৌছে গেল। সেখানে গিয়ে তাকে র‍্যাব-৫ এর কার্যালয়ে ঢুকানো হয়। অতঃপর তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দুই তলাতে তোলা হয়।

যেখানে গিয়ে এক রুমে ঢুকতেই দেখতে পায়, তার পছন্দের আরো ৩টি মুখ। আলিফ, আশরাফুল ও জুয়েল শেখকে। তারাও তাকে দেখে তাদের চেহারায় যেন শত কষ্ট ও নির্যাতনের পরেও আনন্দের ছাপ। অতঃপর তাদেরকে দিয়ে র‍্যাব সদস্যরা বিভিন্ন কাগজে সই ও ছবি তোলা এরূপ বিভিন্ন কাজ সম্পূর্ণ করে দ্রুতই তাদেরকে থানায় জমা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিলো। এবং গাড়িতেও তোলা হলো তাদেরকে। এমন সময় একজন এসে বলে, মাহমুদ কে? সে বলে, আমি। সেই সদস্য বলে, স্যার আপনার সাথে কথা বলবে। রুমে বসে আছে, আসেন। অতঃপর তারা বাকি ৩ জনকে বসিয়ে রেখে তাকে নিয়ে যায় এবং তাদের স্যারের সামনে উপস্থিত করায়। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তুমি জিহাদ বিষয়ে খুৎবা দাও কেন? তোমার কাছে সারা দেশ থেকে মানুষ আসে কেন? তারা তোমাকে এত ভালবাসে কেন? এই সকল বিষয় ইত্যাদি। সে তাদের প্রশ্নের সকল উত্তর বিচক্ষণতার সহিত দেয়। পরে তাকে সেখান থেকে নিয়ে গাড়িতে তোলা হয়। অতঃপর তাদেরকে সেই রাতেই শাহ মখদুম থানায় পুলিশের কাছে জমা দেয়। জমা দেয়ার পূর্বে তাদের সামনে যেই সকল জিনিস রেখে ছবি তোলা হয়, তা দেখে তো সে অবাক। জিজ্ঞেস করে এইগুলো কী? এখানে রেখে ছবি তুলছে কে? তাদেরই একজন বলে, আপনাদের ঐ বাড়ি থেকে সড়ানোর পর আমাদের সামনে এই সকল জিনিস রেখে গ্রামবাসীকে ডেকে এনে দেখায় তারা। যেন গ্রামবাসী সাক্ষী থাকে আমাদের কাছে এগুলো পাওয়া গেছে। সেখানে যা ছিল- ১ পিস বিদেশী পিস্তল, যা তারা শিশু আলিফের পকেটে ভরে দিয়েছিল। তার সাথে ছিল ৫ পিস গুলি ও ১ পিস ম্যাগাজিন। আর সামনে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল বিভিন্ন জিহাদী বই। যা তারা পূর্বে কখনোই দেখেনি।

অতঃপর তাদেরকে থানায় পুলিশ জমা নেয়। এবং পরের দিন তাদেরকে থানাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করে, আর এই জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে এক হিন্দু ওসি; সম্ভবত সে অন্য কোন থানার। সে জিজ্ঞাসা করে মাহমুদকে, 'তোর কাছে বাংলাদেশের সংবিধান ভালো না কুরআন ভালো?' সে বলে, 'অবশ্যই কুরআন ভালো ও সর্বশ্রেষ্ঠ।' ওসি বলে, 'এখন তো প্রমাণ হলো তুই জঙ্গী। বাংলাদেশের সংবিধান বেশি বেশি না পড়ে, কুরআন বেশি বেশি পড়িস কেন? এতো সম্পূর্ন জঙ্গীর লক্ষণ।' (নাউযুবিল্লাহ!)

কথাগুলো জেনে হয়তো অনেকেরই মনে হতে পারে এমন প্রশ্ন কি তাই কেও করতে পারে? হ্যাঁ, এই প্রশ্নগুলোই করা হয়েছে তাকে। আর এমনভাবেই করেছে ঐ ওসি। অতঃপর থানাতে তার মা, খালা ও দুই ভাই আসে। তাদেরকেও বিভিন্ন কটু কথা শোনায় থানার দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ। বিশেষ করে এস.আই সোহেল রানা। অতঃপর তাদের সাথে দেখা করার পরেই থানা থেকে তাদের কোর্টে দেয় থানা পুলিশ। অতঃপর তাদেরকে কোর্ট থেকে জেলে পাঠানো হয় ২১শে নভেম্বর ২০২০ইং তারিখ শনিবার সন্ধ্যায়। তাদের দিন, সপ্তাহ ও মাস অতিবাহিত হতে থাকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সেলে। শুরু হয় বন্দী জীবন। অনুরূপভাবে সিরাজগঞ্জ জেলেও সেই একই দিনে পাঠানো হয় আরো ৪ জনকে। শুধু বাকি থাকে জুয়েল রানা। শুরু হয় তার প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এমনভাবেই চলে প্রায় একমাস। সেই সিরাজগঞ্জ র‍্যাব-১২ এর গুম খানায় গুম ঘরে।

হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেন, এক মাস তাই গুম রাখে? হ্যাঁ, একমাসই তাকে গুম করেছে। ঠিক ডিসেম্বরের ২১ কি ২২ তারিখের পত্রিকায় আবার ছোট একটি অভিনয় করেছে তাকে নিয়ে। এটাও তো সাধারন। কতো মানুষকে তারা ২ মাস, ৩ মাস, ১ বছর, ২ বছর ধরে গুম করে রেখেছে। কাউকে গুম করে রেখেছে গুম ঘরে, আবার কাউকে গুম করে রেখেছে টয়লেটে। যদিও তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাসযোগ্য। তবুও বলছি, র‍্যাব, ডিবি, এ.টি.ইউ, সিটি এই জাতীয় যত প্রশাসন বাহিনী আছে, তাদের সকলের কাছেই, সকল সময়ের জন্য গুম হয়ে আছে অসংখ্য মানুষ। তাদের গুম ঘর ও বাথরুম বা অন্যান্য স্থানে খোজ করলেই পাওয়া যাবে এমন হাজার হাজার নিরপরাধ অসহায় মানুষ। যেমন করে ধান, গম, মশুর ডাল, পিয়াজ ইত্যাদির ব্যবসায়ীরা মাল গুদামে স্টোক করে দাম পেলে সময়মতো বাজারে ছাড়ে, ঠিক অনুরূপভাবেই এই সকল বাহিনীগুলোও হাজার হাজার মানুষকে গুম করে রাখে। যখন যাকে যেভাবে ছাড়লে প্রমোশনের সম্ভাবনা থাকে, তার সাথে তখন তেমন ভাবে অভিনয় করে গ্রেফতার দেখায়।

এটাই হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশের প্রশাসনের কার্যকারী ভূমিকা। এটাই তাদের অভিযান। এই ভাবেই তারা গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পায়। নিজেদের প্রমোশন পাবার জন্য আলিফের মতো একজন শিশুর পকেটে পিস্তল ডুকিয়ে দিয়ে নাটক করে তারা। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের মোহে পড়ে জুয়েল মাহমুদের মতো শারীরিক এক অসুস্থ ব্যক্তিকেও জঙ্গী মামলা দিয়ে জেলে পাঠায় তারা এবং আদালতে তার আবার রিমান্ড শুনানিও করে র‍্যাব। আদালতে এই স্বার্থান্বেষী কান্ডজ্ঞানহীন লোভী ব্যক্তিদের কান্ড দেখে মাজিস্ট্রেট নিজেই অবাক। তার শারীরিক অবস্থা দেখে না মঞ্জুর করে দেন তার রিমান্ড। এই হলো বাংলাদেশের প্রশাসন, এরাই নাকি জনগণের বন্ধু। সরকার ও তার প্রশাসনের সেই রাখাল ছেলের গল্পটা বারবার স্মরণে রাখা উচিত।

সে শারীরিভাবে অসুস্থ, তার পরেও তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানোর পরেও তার রিমান্ড চেয়েছে প্রশাসন। এখানেই শেষ নয় বরং তার জেল বন্দী অবস্থায় তার রাজশাহীর ভাড়া বাড়ি থেকে তারা চুরি করেছে অনেক আসবাবপত্র। এমনকি তার দোকানের অনেক পণ্য দ্রব্যও। চুরি করেছে দোকানের মাল টানা ২টি অটোরিকশা, ১টি ভ্যান, বাড়ির গ্যাসের চুলা ও

সিলিন্ডারসহ বিভিন্ন কিছু। এ থেকে আলমারি, ওয়ারড্রবও বাদ যায়নি। তাছাড়াও নাটকীয় অভিনয় করতে তারা এখানেও ভুলে যায়নি।

রাজশাহী শাহ মখদুম থানার এস.আই সোহেল রানা এর নেতৃত্বে থানা পুলিশরা লুটপাট ও চুরির দ্বিতীয় পর্ব শেষ করার পর জোরপূর্বক এই স্বীকরোক্তি নিয়েছে যে, আমরা বাড়ির সকল মাল বুঝে পেয়েছি। এবং তা ভিডিও করে প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখতে চেয়েছে তারা। যখন তার পরিবার বলেছে, আমরা তো বাড়ি ও দোকানের সকল মাল বুঝে পাইনি, তখন তাদের সাথে কঠিন আচরণ ও উচ্চ-বাচ্চ করেছে এবং অনেক ভয় ও হুমকি দিয়ে একথা স্বীকার করিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে রেখেছে যে, আমরা বাড়ি ও দোকানের সকল মাল বুঝিয়া পেয়েছি।

কাহিনিটা সম্পূর্ণ জানার পর বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে অন্তত এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে কোন জঙ্গী নেই। যদি ২/১ টি হয়ে থাকে তবে প্রশাসনের এই নির্যাতন ও অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন আর নাটকীয় অভিনয়ের জন্যই হয়েছে। কাজেই সরকারের জানা উচিত, যতদিন এই দেশে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের হাতে প্রাশাসনিক ক্ষমতা থাকবে, ততদিন এই দেশ থেকে জঙ্গী দূর হবে না। কারণ জঙ্গী প্রশাসনই তৈরি করছে। মাহমুদের সাথে এতকিছু ঘটার পরেও সে তাদেরকে মুসলিম মনে করে, তাদেরকে ভাই মনে করে। এই ভেবে যে, যদিও তারা অন্ধ; তারা যখন ইসলাম সঠিকভাবে বুঝবে, ন্যায়-অন্যায় তাদের চোখে ধরা দেবে, তখন তারাই সংশোধন হয়ে দেশ ও জাতির খেদমাত করবে। কিন্তু আমি লেখক হিসেবে জানাতে চাই, সকল মানুষেরই মন ও চিন্তাধারা এক নয়, কাজেই সরকার ও তার প্রশাসনের 'রাখাল ছেলের' সেই গল্পটি বারবার স্বরণে রাখা উচিত- সেই জন্যই আমি গল্পটা আবার উল্লেখ করছি।

একটি ছেলে বনের পাশে ছাগল চড়াতো। হঠাৎ একদিন সে মনে মনে ভাবল, আমি গ্রামবাসীদের সাথে হাসি-তামাশা করবো। অতঃপর সে বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে বলে চিৎকার করে উঠলো। লোকেরা তার চিৎকার শুনে লাঠি-সোঠা নিয়ে দৌড়িয়ে আসলো। এসে দেখলো বাঘের কোন লক্ষণ নেই। ঐ দিকে ছেলেটা একটি গাছের নিচে বসে খিল খিল করে হাসছে। এতে করে লোকেরা বুঝে নিলো ছেলেটা তাদের সাথে মশকরা করেছে। তাই তারা ফিরে গেল। পরের দিন ছেলেটা একই কান্ড করলো। লোকেরা লাঠি-সোঠা নিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু আজও তারা ছেলেটিকে পূর্বের ন্যায় পেল। এতে তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে নিলো যে, ছেলেটা মিছামিছি কান্নাকাটি করে তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করেছে। ছেলেটি তার অভ্যাস মোতাবেক প্রায়ই এভাবে চিল্লাচিল্লি করতো। কিন্তু কেউ তার কথায় বিশ্বাস করতো না। কিন্তু হঠাৎ করে বনের ভিতর থেকে একটি বাঘ বের হয়ে আসলো। ছেলেটি বাঘ দেখেই চিৎকার করে উঠলো এবং লোকজনের কাছে সাহায্য চাইলো। কিন্তু লোকেরা তার চিৎকার শুনেও বিশ্বাস করলো না। তারা মনে করল, অন্যান্য দিনের মতোই সে তাদের সাথে মশকরা করছে। তাই তার সাহায্যে কেউ এগিয়ে এলো না। অতঃপর বাঘ প্রথমে বকরীর উপর আক্রমন করল এবং ছেলেটির উপরও আক্রমন করল।

অনুরূপভাবে, আমাদের এই মুসলিম জাতি ও তার বিভিন্ন দল মতের ভাইদের জন্য আরো একটি গল্প স্মরণে রাখা আমি মনে করি অবশ্যই প্রয়োজন আর সেই গল্পটি আমি নিম্নে উল্লেখ করছি।

গল্পটি চারটি গরুকে নিয়ে। তাদের মধ্যে একটি ছিল সাদা আর বাকি ৩ টি ছিল কালো বর্ণের। তারা হিংস্র নেকড়ে পরিবেষ্ঠিত খুব বিপদজনক একটি জায়গায় থাকতো। কিন্তু তারা সবসময় একসাথে থাকতো। একে অপরের প্রতি খেয়াল রাখতো এবং চোখ কান খোলা রাখতো। ফলে বিপদ সংকুল এলাকায়ও তারা টিকে থাকতে পেরেছিল। কিন্তু একদিন

কালো গরু ৩টি গোপনে এক জায়গায় একত্রিত হলো। তারা বলল, সাদা গরুটা আমাদের জন্য বড় ঝামেলার সৃষ্টি করছে। আমরা কালো হওয়ায় রাতে আমাদের কেউ দেখতে পায় না, আমরা সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু ওই সাদা গরুকে অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে। ফলে আমরা সহজেই ধরা পড়ে যেতে পারি। তাই এক কাজ করা যাক, আমরা তিনজন একসাথে থাকি আর ঐ ঝামেলাটাকে আলাদা করে দেই। কথামতো সেইদিন থেকে তারা তিনজন বেচারা সাদা গরুটাকে আলাদা করে দিলো। এদিকে নেকড়ে ছিল খুব চালাক। সে গরুগুলোর ভিতর বিভেদ বুঝতে পেরে সাদা গরুটাকে আক্রমন করলো। কালো গরু তিনটি কোনো বাধাই দিল না। তাদের ভাইকে যখন টুকরো করা হচ্ছিলো তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলো। কিন্তু নেকড়ে পরদিন রাতে তাদের তিনজনকেই আক্রমন করে বসলো। কারণ নেকড়ে বুঝতে পেরেছিল, যেহেতু একটা গরু কম ছিল, তাই তারা এখন আগের তুলনায় দুর্বল। তাদের শক্তি অনেক কমে গেছে। ফলসরূপ, নেকড়ে একটি কালো গরুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। পরদিন রাতে নেকড়ের কাজ আরো সহজ হয়ে গেল। কারণ এখন গরুর সংখ্যা আরো একটি কমে দুইটিতে দাড়িয়েছিল। তারা অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু নেকড়ে আরো একটি গরুকে মেরে ফেলতে সক্ষম হলো। তার পরের দিন মাত্র একটি গরুই বেচে ছিল। তাই নেকড়ে যখন তাকে আক্রমন করতে আসলো গরুটি বাধা দেবার পরিবর্তে প্রাণ পনে ছুটতে শুরু করল। নেকড়ে খুব ধীরে সুস্থে আগাচ্ছিল, কারণ সে জানে গরুটি এক সময় ক্লান্ত পড়বে। তাকে বাচানোর মতো কেউ আর অবশিষ্ট নেই।

সুতরাং, তাড়াহুড়া না করে নেকড়ে যথা সময়ে গরুটির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। ঠিক তখনই গরুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলল, যে কথা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। গরুটি বলেছিল, **‘আমি সেইদিনই মারা গিয়েছি যেদিন সাদা গরুটি মারা গিয়েছিল। আমি নিজের মৃত্যুকে সেদিনই ডেকে এনেছিলাম। আমি এখন মারা যাচ্ছি না। আমি আজ মারা যাচ্ছি না। আমি সেদিনই মারা গিয়েছি, যেদিন আমি সাদা গরুটিকে নেকড়ের হাতে একাকি ছেড়ে দিয়েছিলাম’।**

আপনারা হয়তো গল্পটি পড়ে এতক্ষণে বুঝতেই পেরেছেন গল্পের সারমর্ম কী? কী বুঝাতে চাওয়া হয়েছে গল্পটিতে। হ্যাঁ, আমি বুঝাতে চেয়েছি মুসলিম জাতির ঐক্যের গুরুত্ব। আর তা অবহেলার কারণে ক্ষতির দিকও। কাজেই নেকড়ে যখন সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের জঙ্গী বলে গ্রেফতার, গুম ও হত্যা করছে তখন অন্যদেরও তাকে জঙ্গী বলে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। মনে রাখবেন, যাদেরকে জঙ্গী বলে ধরা হচ্ছে, মারা হচ্ছে তারা আর অন্য কেহ নয়, আপনাদেরই ভাই। কাজেই আপনাদেরকেই জাগতে হবে। যদি আপনারাও তাদেরকে জঙ্গী বলে অ্যাখ্যায়িত করে বসে থাকেন। একদিন কালো শেষ গরুটির অবস্থা আপনাদেরও হবে। জঙ্গীর মিথ্যা অপবাদ একদিন আপনার ঘাড়ে এসেও চাপবে। কারণ, আপনিও মুসলমান, আপনিও দাড়ি রাখছেন, নামায পড়ছেন। তারা আপনার ভেতরেও জঙ্গীর এই লক্ষণগুলো পাচ্ছে।

এটা শুধু সাধারণ মুসলমানদের জন্য আর ইসলামী দলগুলোর জন্য তা নয়, বরং এটা প্রশাসনের মধ্যে থাকা মুসলমানদেরকেও বলছি। একদিন আপনাদের স্থান মুশরিকদের দখলে চলে যাবে। আর আপনাদের পরিণতি হবে আমাদের মতোই। সেই দিনটি বেশি দূরে নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ সেই দিকেই আগাচ্ছে। মনে রাখবেন, রাত যত গভির হয় দিন ততো নিকটে আসে। আমার এই প্রবন্ধটি পড়ে হয়তো প্রশাসনের ভাইয়েরা ভাববে, হয়তো আমি জঙ্গীদের পক্ষের লোক অথবা মাহমুদের পক্ষের কেহ। কিন্তু আমি এটা বলতে পারি, আমি জঙ্গীদের পক্ষের কোন লোক না অথবা মাহমুদের পক্ষেরও কোন লোক না। আমিও মাহমুদের মতোই একজন ভুক্তভোগী। কাজেই সত্য কথাটাকেই

তুলে ধরতে সাহস দেখালাম। আর পেশাগত সাংবাদিক না হয়েও সাংবাদিকের কাজে লিপ্ত হলাম, তবে প্রশাসনের পাশে থেকেই প্রশাসনের এই কাজ ও কথাগুলো সংগ্রহ করা আমার জন্য অতি কষ্টদায়ক হলেও, এটাতেই আমি মনোস্থির করলাম।

"কলম চলবে সত্যের পক্ষে" - আবু উমার

আল্লাহ হাফিজ।